কলকাতার বিজন দ্বীপে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

কলকাতার বিজন দ্বীপে

০১.

অনেকেই কলকাতায় অনেককাল থেকেও শহরের অনেক খবরই রাখেন না। ধরুন, এই গঙ্গা নদীর কথা। গঙ্গা যে খালি কলকাতার তেষ্টা মেটায়, তা নয়; বাণিজ্যে কলকাতার লক্ষ্মীলাভের আসল কারণই ওই গঙ্গা! স্নান করতে গিয়ে, বেড়াতে গিয়ে বা পারাপার হতে গিয়ে গঙ্গাকে দেখেনি কলকাতায় এমন লোক নেই। তবু জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে, কলকাতার গঙ্গার বুকেও যে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে দিব্যি একটি ছোট্ট দ্বীপের মতন বালুচর জেগে ওঠে, এ দৃশ্য অনেকেই দেখেননি।

আমার আজকের বন্ধুরা ছিলেন ওই দলে। গঙ্গার ধারেই আমার বাড়ি। সকালে এসেছিলেন তারা আমার বাড়িতে বেড়াতে। গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে চা পান করতে করতে হঠাৎ ওই বালুচর দেখে তারা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বাগবাজারের কাছ থেকে বালুচরটি সমান চলে গিয়েছে বালি ব্রিজের দিকে। চওড়ায় তা বেশি নয় বটে, কিন্তু লম্বায় হবে অন্তত মাইল খানেক। বেশি হতেও পারে।

পরেশের বোন ছন্দা, বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। পয়লা নম্বরের শহুরে মেয়ে, জন্মে কখনও পল্লীগ্রাম বা ধানের খেত দেখেনি। সবচেয়ে বিস্মিত হল সে। বললে, কলকাতা শহরে দ্বীপ! এ কী অদ্ভুত দৃশ্য।

আমি বললুম, কিছুই অদ্ভুত নয়! গঙ্গায় এ সময়ে রোজই দিনে আর রাতে ভাটার সময়ে চড়া পড়ে, আবার জোয়ার এলেই ডুবে যায়!

পরেশ বললে, এ খবর তো জানা ছিল না!

নবীন বললে, আমরা বালিগঞ্জবাসী জীব, পাশের বাড়ির খবর রাখি না, বাগবাজারের গঙ্গা তো আমাদের পক্ষে দস্তুরমতো বিদেশি নদী, ম্যাপ দেখে তার অস্তিত্বের খবর পাই।

ছন্দা বিপুল পুলকে নেচে উঠে বলল, ওখানে যাওয়া যায় না বড়দা?—সে আমাকে বড়দা বলে ডাকত।

বললুম, খুব সহজেই। একখানা মাত্র পানসির দরকার!

পরেশ সোৎসাহে বললে, ডাকো, তাহলে একখানা পানসি! আমরা ভারতের প্রধান নগর কলকাতার মাঝখানেই দ্বীপভ্রমণ করব!

নবীন বললে, তারপর ভ্রমণকাহিনি লিখে মাসিকপত্রে প্রকাশ করব! আমি বললুম, সাধু! ঠাট্টা করে বললুম বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারিনি যে, আমাদের এই ভ্রমণটা সত্য-সত্যই একটি চমকপ্রদ অসাধারণ কাহিনি হয়ে দাঁড়াবে।

০২.

গঙ্গার চড়ায় গিয়ে লাগল আমাদের পানসি। চরের এক জায়গায় খানকয় বড়ো বড়ো নৌকা বাঁধা। অনেকগুলো কুলি চর থেকে ঝুড়ি করে বালি তুলে নৌকোয় গিয়ে বোঝাই করে আসছে। গঙ্গার একপারে কলকাতার অগণ্য বাড়ির থাক সাজানো রয়েছে এবং আর একপারে গাছের সার, চিমনিওয়ালা কলকারখানা ও মন্দির প্রভৃতি। উত্তর দিকে বালির রাঙা সাঁকো এবং তারই একমুখে দক্ষিণেশ্বরের কালিমন্দির ও আর একমুখে বেলুড়ের নতুন মঠের গম্বুজ।

চরের যে-দিকটা নির্জন আমরা সেইদিকে গিয়ে নামলুম।

বাতাসে কালো চুল ও বেগুনি শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছন্দা মহা আনন্দে ভিজে বালির ওপরে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

নবীন এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, চরটাকে ডাঙা থেকেই ভালো দেখাচ্ছিল। এখানে তে ভ্রমণকাহিনি লেখবার কোনও রঙিন মালমশলাই চোখে পড়ছে না! ওখানে বালি বোঝাই নৌকো, চরের চারপাশে গঙ্গার ঘোলা জল আর জেলেডিঙি, মাথায় ওপরে উড়ছে কতকগুলো গাংচিল–ধেৎ, এই নিয়ে কি ভ্রমণকাহিনি রচনা করা যায়?

পরেশ বললে, রাখো তোমার ভ্রমণকাহিনি! জীবনে যা দেখিনি, আজ সশরীরে সেই দ্বীপে আরোহণ করলুম, এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা! এ ঠাঁইটিকে আমরা যদি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা কি সিংহলের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করি, তাহলে কার সাধ্য প্রতিবাদ করে?

এমন সময়ে খানিক তফাত থেকে ছন্দা চেঁচিয়ে ডাক দিল, বড়দা, একবার এদিকে এসে দ্যাখো তো এগুলো কীসের দাগ!

তার কাছে গিয়ে দেখি, বালির ওপরে হেট হয়ে পড়ে অত্যন্ত কৌতূহলে কীসের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে।

বালির ওপরে অনেকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন!

পরেশ দেখে বললে, পায়ের দাগ। না। আমি বললুম, কিন্তু কোন জীবের পায়ের দাগ? আমরা কেউ পদচিহ্নবিশারদ না হয়েও বলতে পারি, এ দাগগুলো কোনও চতুষ্পদ জীবের পায়ের দাগ নয়! এগুলো যার পায়ের দাগ, সে দুই পায়ে হাঁটে। মানুষ দুই পায়ে হাঁটে, কিন্তু এগুলো মানুষের পায়ের দাগ নয়। পাখি দুই পায়ে হাঁটতে পারে বটে, কিন্তু কোনও পাখির পায়ের দাগই এত বড়ো বা এরকম দেখতে হয় না। এমন বড়ো যার পা, তার দেহও না জানি কত প্রকাণ্ড। দেখছ পরেশ, এর পায়ে মস্ত মস্ত নখও আছে? কী ভয়ানক! যে এমন পায়ের অধিকারী তার চেহারা দেখলে পেটের পিলে হয়তো চমকে যাবে!

নবীন চোখ পাকিয়ে বললে, দুই সার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। গঙ্গা থেকে কোনও জীব উঠে চরের ওপরে এসে আবার জলে ফিরে গিয়েছে?

আমি বললুম, কিন্তু কোনও জলচর জীবই দুই পায়ে ভর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে! কুমির ডাঙায় ওঠে, তার পায়েরও অভাব নেই—কিন্তু চারখানা পা।

পরেশ এক কথায় সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে বললে, তাহলে এগুলো পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু পায়ের দাগই নয়!

নবীনও সায় দিয়ে বললে, সেই ঠিক কথা! গঙ্গার স্রোতের তোড়ে বালির ওপরে এই অদ্ভুত দাগগুলো হয়েছে!

আমিও তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলুম না। এগুলো কোনও জীবের পায়ের দাগ হলে তাকে সৃষ্টিছাড়া আজগুবি জীব বলেই মানতে হয় এবং তেমন উদ্ভট জীব কলকাতার গঙ্গার চরে আসবে কেমন করে? এলেও খবরের কাগজের সর্বদর্শী রিপোর্টারদের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারত না, অন্তত বাগবাজারের অমৃতবাজার পত্রিকা সর্বাগ্রেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলত!

যার আবদারে আমরা এই চিহ্নগুলি পরিদর্শন করতে এদিকে এসেছি, সেই ছন্দা কিন্তু এতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল না, সে কখন সরে পড়ে দূরে গিয়ে চরের ওপরে বসে শিশুর মতো বালির ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল!

কড়া রোদে ঘেমে উঠে ছন্দাকে ডেকে আমরা আবার পানসির দিকে ফিরে চালুম। ছন্দা এসে বললে, আমার ভারী ভালো লাগছে। এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর থাকার উপায় নেই। একটু পরেই জোয়ার আসবে, চর ডুবে যাবে। ছন্দ। একটু ভেবে বললে, আচ্ছা, বড়দা, রাতে আবার এই দ্বীপটা জেগে উঠবে তো? হ্যা, ঘণ্টা চারেকের জন্যে। আজ তো পূর্ণিমে? সন্ধেবেলাতেই চাঁদ উঠবে? হা।

তাহলে আজ সন্ধেবেলায় এখানে সকলের নিমন্ত্রণ রইল। আমি চড়িভাতি করে তোমাদের সবাইকে খাওয়াব।

পরেশ একটু ইতস্তত করে বললে, কিন্তু সে যে অনেক তোড়জোড়ের ব্যাপার! দরকার নেই ছন্দা!

প্রস্তাবটায় নতুনত্ব আছে। আমি রাজি হয়ে গেলুম।

তোড়জোড়ের জন্যে তোমাদের কারুকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না দাদা। আমি সব গেছি ছি করব, তোমরা খালি দয়া করে দুটো খেয়ে উপকার কোরো।

এর পরেও আপত্তি করা অভদ্রতা, এবং পরেশ সেই অভদ্রতাই করলে। বললে, তুমি যা মেয়ে, তা জানি। আবার জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়তেই চাইবে না! অতক্ষণ এই ভিজে বালির ওপরে বসে থাকলে অসুখ করবে। অতটা কবিত্ব আমার নেই।

ছন্দা রেগে বললে, দাদা, গেল-জন্মে তুমি মাড়োয়ারি ছিলে, তোমার একটুও imagination নেই! বেশ, আমাদের জন্যে চারখানা ফোল্ডিং চেয়ারও আসবে, কারুকেই ভিজে বালিতে বসতে হবে না!.বড়দা, পানসিখানা আজ সন্ধে থেকে ভাড়া করে রেখো। প্রথমে চড়িভাতির ভোজ, তারপর চন্দ্রালোকে নৌকোয় করে গঙ্গায় ভ্রমণ,–ওঃ, ওয়ান্ডারফুল!

০৩.

ছন্দা, পরেশ ও নবীন নৌকোর ঘরের ভেতরে গিয়ে বসল, আমি গেলুম বুড়ো মাঝির কাছে।

ওহে মাঝি, আজ সন্ধের সময়ে তোমার নৌকো নিয়ে আমরা আবার এই চরে আসব। তুমি ঘাটে তৈরি থেকো।

সন্ধের সময়? ওই চরে? কতক্ষণ থাকবেন?

যতক্ষণ জোয়ার না আসে।

মাঝি চুপ করে রইল।

কী হে, কথা কও না যে?

মাঝি খুব মৃদুস্বরে বলল, সন্ধের পরে ওই চরে কেউ থাকে না। জায়গাটার বদনাম আছে।

বদনাম! কীসের বদনাম?

অল্পক্ষণ ইতস্তত করে মাঝি বললে, কীসের বদনাম জানি না বাবু। আমাদের বুদ্ধ ওখানে হারিয়ে গিয়েছিল।

কেমন করে? ওখানে তো হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই?

তা নেই। কিন্তু বুদ্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তাহলে সে জলে ডুবে গিয়েছিল।

হতেও পারে, না হতেও পারে। ওই চরে আমরা নৌকো বেঁধেছিলুম। অন্ধকার রাত। আমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, হঠাৎ কী দরকার হওয়াতে বুদ্ধ চরে গিয়ে নামল। তারপরেই শুনি সে বিকট চিৎকার করে উঠল। আমরা সবাই আলো-টালো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু আর বুদ্ধুর সাড়া কি দেখা পাওয়া গেল না! ওই রাক্ষুসে চর যেন তাকে গিলে ফেললে!

চর নয়, মাঝি! তাকে গিলে ফেলেছিল এই গঙ্গা!

হতেও পারে, না হতেও পারে। তার কিছুকাল পরে আর এক রাতে বদরিও ওই চরে নৌকো বেঁধেছিল। সকালে উঠে দেখে, তাদের দলের একজন লোক নেই। সে যে কোথায় গেল, তা কেউ জানে না...বাবুজি, ও চরের ভারী বদনাম।

যত সব মিথ্যে ভয়। গঙ্গায় তো রোজই লোক ডুবছে, চরের দোষ দাও কেন?..তাহলে তোমার নৌকো পাওয়া যাবে না?

পাওয়া যাবে না কেন বাবুজি, পয়সার জন্যেই তো নৌকো চালাই। আপনি পয়সা দিচ্ছেন, আমরাও নৌকো আনব। তবে কিনা, জায়গাটার বদনাম আছে!

নৌকোর তরে আসতে ছন্দা বললে, বড়দা, মাঝির সঙ্গে অত কীসের কথা হচ্ছিল?

বাজে কথা!

মিথ্যা তার মনে ভয় জাগানো উচিত নয়। আমার কাছে মাঝির গল্প হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল! তবে একটা ভয় আছে। চরে চোরাবালি নেই তো?

০৪.

গঙ্গা তখন চাঁদের আলোর সঙ্গে খালি খেলাই করছিল না, গল্পও করছিল কুলুকুলু স্বরে। সেই গল্প যারা বুঝতে পারে তারাই হয় কবি। আমরা কবি নই, আমাদের মন চড়িভাতির কথা ভেবেই সরস হয়ে উঠছে।

তা ছন্দা উদর-তৃপ্তির আয়োজন বড়ো কম করেনি। মাংস হবে, খিচুড়ি হবে, আরও কী কী হবে! ভীম নাগের সন্দেশ, নবীন ময়রার রসগোল্লা, আমের চাটনিও এসেছে এক বোতল। একে চড়িভাতি না বলে রীতিমতো ভোজের আয়োজন বলাই উচিত।

ছন্দা দুটো পেট্রলের লণ্ঠন জ্বাললে, যদিও আজকের পূর্ণিমায় তাদের দরকার ছিল না। তারপর দুটো ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দিয়ে বললে, চলো, এইবারে দ্বীপে খানিকটা ভ্রমণ করে আমরা খিদে বাড়িয়ে আসি!

নবীন গম্ভীর হয়ে বললে, খিদে দ্বিগুণ বাড়লে অতিরিক্ত খাবারের জোগান দেবে কেমন। করে? মনে রেখো ছন্দা এখানে কলকাতার খাবারের দোকান নেই, আমরা বাস করছি এক অচেনা বিজন দ্বীপে!

পরেশ বললে, রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপের চেয়েও এ দ্বীপ ভয়ানক। এখানে ফ্রাইডের মতো বিশ্বস্ত ভৃত্যও মিলবে না যে খাবার কিনতে পাঠাব!

ছন্দা হাত নেড়ে বললে, ওগো ক্ষুধার্ত ভদ্রলোকরা, থামো! তোমাদের ভুঁড়ির বহর জানা আছে।...চলো বড়দা!

আমরা চর ধরে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখে নৌকো থেকে মাঝি সাবধান করে দিলে, বেশিদূর যাবেন না বাবু, এটা বেড়াবার জায়গা নয়!

মাঝির কথার মানে বুঝে আমার হাসির পেলে। এখানে কীসের ভয়? আকাশ ভরে জাগছে চাঁদের মৌন সংগীত, কানে আর প্রাণে জাগছে ঠান্ডা বাতাসের গুঞ্জন এবং বালুচরের কূলে কূলে জাগছে গঙ্গার রচিত কবিতার ছন্দ! এপারে-ওপারে আলোর মালায় মালায় দেখছি যেন দীপাবলির উৎসব!

ছন্দা খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, মাঝিবুড়োর কথা শোনো! এটা বেড়াবার জায়গা নয় তো ঘুমোবার জায়গা নাকি?

পরেশ বললে, আমার কীরকম ঘুম আসছে ছন্দা! ওই কুলুকুলু শব্দ, এই ঝিরঝিরে বাতাস আর এমন ঝিলমিলে জ্যোৎস্না! সবই কেমন স্বপ্নময়!

আমি বললুম, সবই যখন স্বপ্নময় আর সংগীতময়, তখন ছন্দার গলাও আর চুপ করে থাকে কেন? ছন্দা, চলতে চলতে তুমিও রবি ঠাকুরের একটি গান ধরে ফ্যালো।

ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতের ওপরে সজোরে ও সশব্দে এক তালি বসিয়ে দিয়ে নবীন বলে উঠল, ঠিক বলেছ, লাখ টাকার এক কথা! এ সময়েও যদি রবি ঠাকুরের গান

হয় তাহলে বৃথাই তিনি সংগীত রচনা করেছেন। গাও ছন্দা!

ছন্দা আপত্তি করলে না। রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব জিনিসের মতো, তার সঙ্গে আজকের এই জ্যোৎস্নামাখা গঙ্গার কলতান এমনি খাপ খেয়ে গেল।

আমি বললুম, চমৎকার ছন্দা, চমৎকার। এখানে মানুষের বীণা-বেণুর সঙ্গত নেই, তুমি যেন তাই গঙ্গার সুরে সুর মিলিয়েই গান ধরেছ!

ছন্দা খানিকক্ষণ নীরবে কান পেতে গঙ্গার ঢেউয়ের গান শুনলে। তারপর বললে, গঙ্গার সুর? যদি তোমরা কেউ এখানে না থাকতে, যদি এই নির্জন চরে একলা বসে বসে

আমাকে গঙ্গার এই কল্লোল শুনতে হত, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভয় পেতুম!

ভয় পেতে। সে কী!

চেয়ে দ্যাখো না, পূর্ণিমার চাঁদও পৃথিবীকে স্পষ্ট করতে পারেনি, আলোর সঙ্গে যেন আবছায়া মাখানো। কলকাতার বাড়িঘর এত কাছে, কিন্তু এই নির্জন নিরালা বালুচরের সঙ্গে আজ মানুষের কোনও সম্পর্কই আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে না! আজ আমরা যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি। মনে হচ্ছে এই চরের যেন আত্মা আছে, আর মানুষের ছোঁয়া পেয়ে সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে! গঙ্গার ডাক শুনছ? ও ডাক ছুটে আসছে যেন অতল পাতালের গভীর অন্ধকার থেকে–যেখানে হাসি নেই, আলো নেই, মানুষ নেই; যেখানে পাতা আছে শুধু শীতল মৃত্যুর কঙ্কাল-শয্যা, যেখানে দয়া-মায়া-প্রেমের নাম কেউ শোনেনি! গঙ্গার ও-ডাক কি সংগীত? ও যেন প্রাণদণ্ডের বাণী, ও যেন জীবনের বিরুদ্ধে মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে অভিশাপময় নিষ্ঠুর প্রতিবাদ! মানুষের পক্ষে নিঝুম রাত্রে এখানে একলা থাকা অসম্ভব!

পরেশ বিরক্ত হয়ে বললে, ছন্দা, তুই বড়ো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে শিখেছিস! তুই, যেন আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস!

নবীন কিন্তু কোনও কথাই শুনছিল না, নিষ্পলক নেত্রে একদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে চমকে উঠল!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, খানিক তফাতেই দুটো উজ্জ্বল লণ্ঠন জ্বলছে আর কুকারে আমাদের খাবার সিদ্ধ হচ্ছে।

নবীন, কী দেখে তুমি চমকে উঠলে? ওখানে তো দেখে চমকাবার মতো কিছুই নেই। নবীন অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্বরে বললে, ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো!

তীক্ষ্ণ চোখে আবার সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুক ছম ছম করতে লাগল। ওখানে কিছুই নেই, কিন্তু তবু কিছু যেন আছেও! কী ওটা? ওকে কি শূন্যতার মধ্যে শূন্যতার মূর্তি বলব? না, চাঁদের আলোর মধ্যে ঘনীভূত আলোর মূর্তি? ওকে দেখাও যায়, দেখা যায় না। যেন নিরাকারের প্রকাণ্ড আকার, কিন্তু ভয়াবহ! পূর্ণিমায় ধবধব করছে বালুচর, কিন্তু পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন আর একটা উজ্জ্বলতর আলোকের ছায়া ফেলে কে সেখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আলোকের মধ্যে আলোকের ছায়া! আমার এই অদ্ভুত ভাষা শুনে লোকে হয়তো হাসবে, কিন্তু যা দেখলুম তা অমানুষিক বলেই মানুষী ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব! ওই অনামা ভয়ংকরের হাত-পা-দেহ বা মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বালির ওপরে কেউ ভারী ভারী পা ফেলে চললে যেমন বালি ছিটকে ছিটকে পড়ে, ওখানেও ঠিক তেমনি হচ্ছে!

তখন পরেশ ও ছন্দাও সেই দৃশ্যমান অদৃশ্যের ভীষণ অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছে, বা অনুভব করেছে!

ছন্দা আঁতকে বলে উঠল, ও কে বড়দা, ও কে? ও যে এগিয়ে যাচ্ছে, কুকারের দিকে!

পরেশ সর্বপ্রথম সেই অবর্ণনীয় অলৌকিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে, আমরা সবাই কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছি? বানিয়ে বানিয়ে ভয়ের স্বপ্ন দেখছি? কই, ওখানে তো কেউ নেই! এসো আমার সঙ্গে!

পরেশ দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছে, আচম্বিতে দুটো ইকমিক কুকারই সশব্দে বালির ওপরে কাত হয়ে পড়ে গেল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার ভেতরের খাবারভরা পাত্রগুলো! এবং পরমুহূর্তেই আমাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে, বয়ে গেল একটা ঠান্ডা কনকনে দমকা বাতাসের ঝটকা! ঝটকাটা যেমন হঠাৎ এল, চলে গেল তেমনি হঠাৎ। পরেশ একবার হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়েই আবার এগুবার উপক্রম করলে! নৌকোর মাঝি কিছু দেখেছিল কি না জানি না, কিন্তু সে-ও সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাবু, বু! নৌকোয় চলে আসুন।

আমি বিহুলা ছন্দার হাত ধরে টেনে পানসির দিকে ছুটতে ছুটতে বললুম, নবীন! পরেশ শিগগির নৌকোয় চলো!

০৫.

নৌকোয় চড়ে ঘণ্টাখানেক গঙ্গার বুকে ভেসে চললুম। বালুচর তখন চোখের আড়ালে।

সকলেই যে আমরা সেই চরের কথাই ভাবছি তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলেই এমনি অভিভূত হয়েছি যে মুখ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

পানসি যখন হাওড়ার পুলের কাছে এসে পড়েছে পরেশ তখন বললে, আমরা কি কাপুরুষ! রজ্জুতে সর্পভ্রম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম! মাঝি, নৌকো ফেরাও! আমরা আবার সেই চরে যাব!

মাঝি মাথা নেড়ে বললে, তা আর হয় না বাবুজি! যেতে যেতেই জোয়ার এসে পড়বে, চর ডুবে যাবে।

ছন্দা বললে, চরে যা দেখেছি, আমার আর সেখানে যেতে ইচ্ছেও নেই।

পরেশ উত্তেজিতভাবে বললে, চরে কী দেখেছি আমরা? কিছুই না—একটা ছায়া পর্যন্ত না! খানিকটা বাষ্প উড়ে গেলেও বুঝতুম; আমরা তাও দেখিনি! বোকা নবীনটা বাজে কী ধুয়ো তুললে, আর আমরাও সবাই হাউমাউ করে পালিয়ে এলুম! ছি ছি, কী লজ্জা!

ইকমিক কুকার দুটো কে ফেলে দিলে?

দমকা ঝোড়ো বাতাস! ঝড়ের মতো একটা বাতাসের ঝটকা তো আমাদেরও গায়ে লেগেছিল।

বালি উড়িয়ে কে ওখানে চলে বেড়াচ্ছিল?

বালি উড়ছিল ওই বাতাসেই!

আর সকালের সেই পায়ের দাগগুলো?

জানোই তো, সেগুলো পায়ের দাগই নয়, বালির ওপরে স্রোতের দাগ!

ভাবলুম মাঝির গল্পটা বলি,ওখানে পরে পরে দু-দুটো মানুষ কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, কেউ জানে না। কিন্তু বলতে গিয়ে বললুম না; কারণ নিশ্চয়ই উত্তরে শুনব, তারা জলে ডুবে মারা পড়েছে!

নবীন ফোস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, হায়রে খিচুড়ি, হায়রে ফাউলকারি, হায়রে সন্দেশ-রসগোল্লা, আমের চাটনি! ওগো প্রিয়, তোমাদের পেয়েও হারালুম!

ছন্দা বললে, চলো, চৌরঙ্গির কোনও হোটেলে গিয়ে খাবারের শোক আর পেটের জ্বালা নিবারণ করে আসি গে!